হায় '৭১ হায় গণতন্ত্র হায় স্বদেশ

গোলাম মোর্তোজা

উত্তরবঙ্গের একটি গ্রাম। বেড়াতে এসেছে একদল শহুরে মানুষ। যাদের গ্রামের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ নেই বললেই চলে। এই শহুরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তরা গ্রামের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে দর্শকের মতো, ট্যুরিস্টের মতো। সঙ্গে ভয়ও আছে। সাংস্কৃতিক বিভাজন আছে। এখানে কম্পিউটার নেই। নেই ইন্টারনেট। চ্যাটিং বোঝার মতো জ্ঞান তাদের নেই।

তবে বিদ্যুৎ আছে। কিন্তু কখন থাকে আর কখন থাকে না সেটা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। বেড়াতে আসা এই দলটির মধ্যে তরুণতম ছেলেমেয়ে ছিল, যারা পড়াশোনা করে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে। গ্রামের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্নতা এদেরই। যতটুকু জানে তাত্ত্বিকভাবে। শুধু গ্রাম নয়, শহরের মানুষের সঙ্গেও তাদের সম্পৃক্ততা নেই। থাকে দেশে, নিজেদের ছোট্ট গন্ডিতে। কিন্তু সারা পৃথিবী তাদের ঠিকানা। এরা গ্রামের একজন সাধারণ ছেলের সঙ্গে জীবনে কথা বলেনি, অথচ কম্পিউটারে বসে মেক্সিকোর ছেলেটির সঙ্গে সারারাত চ্যাটিং করে ভোরবেলা ঘুমাতে যায়। গ্রামে এসে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হলো এই এরাই।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৪% বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। যার অধিকাংশেরই বাস গ্রামে। তবে তাদের বিস্ময়ের কারণ দারিদ্র্য নয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের ৪২% মানুষ নিরক্ষর। এই নিরক্ষর মানুষের বড় অংশটিও বাস করে গ্রামে। তাদের বিস্ময়ের কারণ ছিল না এই অশিক্ষাও। তারা বিস্মিত হয়েছিল গ্রামের মানুষের কর্মক্ষমতা দেখে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনে চাওয়া-পাওয়ার চাহিদা কত কম হতে পারে সেটা দেখে। সাধারণ মানুষের জীবন! কিন্তু অনেক নিরাপদ। অনেক দায়িত্বশীল এবং মাটির প্রতি ভালোবাসা। তাদের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আছে। কিন্তু নেই শহুরে মধ্যবিত্তের জটিলতা।

তমিজউদ্দিন মন্ডল এই গ্রামের কৃষক। তার সামান্য একটু জমি আছে। এই জমিতে যে ফসল ফলে তা দিয়ে সারা বছর চলে না। কারণ সংসার বড়। ছয় সন্তানসহ আটজনের সংসার তার। বাকি সময়টা অন্যের দিনমজুরি করে সংসার চালাতে হয়। শহুরে মানুষ দুটি গ্রাম দেখে বিস্মিত হয়েছিল। তমিজউদ্দিন মন্ডল তাদের অভিভূত করলো। হরতালের খবর তমিজ তেমন রাখে না। তবে শহরে হরতালের নামে ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও কেন– এ প্রশ্ন কৃষক তমিজউদ্দিন মন্ডলের। গুজরাটি এই শব্দটির প্রয়োগ গুজরাটিদের জীবনে না থাকলেও আমরা হরতালকে একেবারে আপন করে নিয়েছি। হরতাল হয়ে গেছে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হরতাল বুঝলেও 'ধর্মঘট' বোঝে না তমিজউদ্দিন মন্ডল। ধর্মঘট বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাজ না করে কলকারখানা বন্ধ রাখাটা তমিজ মন্ডল কোনোভাবেই মানতে পারে না। প্রশ্ন করে, কাজ না করলে টাকা পাবে কিভাবে? কাজ না করেও যে টাকা পাওয়া যায় এ কথা কিছুতেই তমিজ মিয়া বিশ্বাস করতে চায় না। যদি তমিজ মন্ডলকে বলা হয় টাকা নিয়ে মাস্তানরা হরতাল করে দেয়, অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ায় শহরের রাস্তায়,

বঙ্গবন্ধুর ছবি আগে নামাতে হবে নাকি পাশাপাশি জিয়াউর রহমানের ছবি রাখতে হবে এ নিয়ে সংসদ এখন সরগরম। রাজনীতিবিদদের আচরণ দেখলে মনে হয় 'ছবি' এখন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। একটি ছবি নামানো হলে এবং আরো একটি বা দু'টি ওঠানো হলেই দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে

দোকান বন্ধ করে! কেমন লাগবে তার?

এই তমিজ মিয়াদের জীবনে কোনো ধর্মঘট নেই, নেই হরতাল বা কর্মবিরতি। তারা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কাজে যায়। তীব্র চোখে খুঁজে দেখে আগাছা জন্মেছে কি না, সবুজ ক্ষেত ঠিক আছে কি না। তমিজ মন্ডলদের ঘামে ভেজা মাটিতে ফলে ধান, পাট, শস্য, সবজি। শহুরে মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ। স্বাধীনতার পর হরতাল, ধর্মঘট প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার বাংলার কৃষক হরতাল-ধর্মঘট করে না। কৃষক যদি ধর্মঘট করতো তাহলে কেউ বেঁচে থাকতে পারতো না।'

কথা ছিল তমিজ মিয়ারা পাট উৎপাদন করবে, আদমজী জুট মিল সেটা প্রক্রিয়াজাত করবে। বিদেশে রপ্তানি হবে সেই পণ্য। আসবে বৈদেশিক মুদ্রা। যার অংশীদার হবে তমিজ মন্ডলরাও। দেশ স্বাধীনের মূলমন্ত্র এমনই ছিলো। তমিজ মন্ডলরা কখনো কথা বরখেলাপ করেনি। ৩১ বছর বয়সী বাংলাদেশে একদিনের জন্য কোনো তমিজ কাজ বন্ধ করেনি। নিরক্ষর তমিজ কাজ করেছে, উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিতদের তারা কখনো পাশে পায়নি। তমিজ মন্ডলরা জানে না পাটের চাহিদা ও দাম দিন দিন এত কমে গেল কেন। আদমজী জুটি মিল যে বছরের অর্ধেক সময় বন্ধ থাকে সে কথাও জানে না তমিজ মন্ডল। সিবিএ অচল করে রাখে উৎপাদন, শ্রমিক নেতারা দখল করে টার্মিনাল। চোরাপথে মাস্তানরা নিয়ে আসে মাদক দ্রব্য। শিক্ষিত রাজনীতিবিদদের একান্ত নিজেদের স্বার্থে ডাকা হরতাল-ধর্মঘটে বছরের অর্ধেক সময় বন্ধ থাকে কলকারখানা। কলকারখানাগুলোর অধিকাংশই একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে অথবা বন্ধ হওয়ার পথে রয়েছে। এক সময় শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উত্তরবঙ্গের বগুড়ায় এখন কলকারখানার আওয়াজ শোনা যায় না। সরকার বা রাজনীতিবিদরা গত ৩১ বছর ধরে শুধু তমিজ মন্ডলদের কাজে প্রতিবন্ধকতাই তৈরি করেছে। কখনো তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। তমিজ মন্ডলরা এখন সেটা চায়ও না। তারা চায় কাজে যেন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা না হয়। তার উৎপাদিত ফসল যেন সে ঠিক দামে বিক্রি করতে পারে, সন্ত্রাসীরা যেন তার ক্ষেতের ধান লুট করে নিয়ে যেতে না পারে– এই নিশ্চয়তা চায়। তমিজ মন্ডল নেতাদের গ্রামে দেখলে ভয় পায়। তার কাছে এক আতঙ্কের নাম– পুলিশ।

আজকের বাংলাদেশের যতটুকু উন্নতি, যতটুকু সমৃদ্ধি তার পুরোটার কৃতিত্ব তমিজ মিয়াদের, কোনো রাজনীতিবিদ বা আমলার নয়। সামরিক বাহিনী আর আমলারা ক্ষমতা হরণ করেছে। রাজনীতিবিদরা তাদের দোসর হয়েছে। অর্থ-সম্পদ লুটপাট করেছে। এর কোনো খবর রাখেনি তমিজ মন্ডলরা। তারা খাদ্য যোগান দিয়েছে। উৎপাদন করেছে।

বাংলাদেশ পরিচালিত হয় দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। সমগ্র বাংলাদেশ যেন দুই পরিবারের সম্পত্তি। দুই পরিবারের সদস্য এবং ১% বা ২% নাগরিক (যারা পরিচিত রাজনীতিবিদ নামে) ছাড়া সব নাগরিকই যেন সেই গ্রিক রাষ্ট্রের ক্রীতদাস। ধনী ও অভিজাতদের নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষার তত্ত্বের নামই এখন গণতন্ত্র

লেক্সাস, নিশান পেট্রোল বা V-6 পাজেরো নিয়ে সংসদে আসেন রাজনীতিবিদরা। এখানে আসার অধিকার তারা পেয়েছেন তমিজউদ্দিন মন্ডলদের থেকে। গ্রিক শব্দ থেকে উৎপত্তি হওয়া শব্দ গণতন্ত্রের হাত ধরেই তারা আজ নিশান পেট্রোলের মালিক। গণতন্ত্র আমাদের জীবনে এখন বহুল প্রচলিত শব্দ। গণতন্ত্রের যারা প্রবক্তা ছিলেন তাদের মতে, 'তমিজউদ্দিন মন্ডলদের ইচ্ছানুযায়ী দেশ পরিচালনার নামই হলো গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক সরকার হলো সেই সরকার যে সরকার জনগণেরই সরকার, জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত সরকার এবং জনগণের জন্যই গঠিত সরকার।' তাহলে বলাই যায়, বর্তমান বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে তমিজউদ্দিন মন্ডলদের মতামতের ভিত্তিতেই। তত্ত্বগতভাবে নিশ্চয়ই একথা বলা যায়। এক যুগ ধরে দুটি দল পালা করে নির্বাচনে জয়ী হলো, কোটি কোটি টাকায় এমপি নির্বাচিত হলো! কিন্তু তিনবারই বয়কট করলো সংসদ। তমিজ মন্ডলদের ভোটের কী হলো? বয়কটের সময় তমিজ মন্ডলের ভোট দরকার হয় না। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দেশ পরিচালনা করছে চারদলীয় জোট। তারা প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা খরচ করে আলোচনা করছে সংসদে। কী আলোচনা করছে? 'ছবি' নিয়ে। কার ছবি কোথায় রাখা হবে, বঙ্গবন্ধুর ছবি আগে নামাতে হবে নাকি পাশাপাশি জিয়াউর রহমানের ছবি রাখতে হবে এ নিয়ে সংসদ এখন সরগরম। রাজনীতিবিদদের আচরণ দেখলে মনে হয় 'ছবি' এখন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। একটি ছবি নামানো হলে এবং আরো একটি বা দু'টি ওঠানো হলেই দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তমিজউদ্দিন মন্ডলের পানির পাম্পটি চলে না তিন দিন ধরে। স্থানীয় ট্রান্সমিটারটি জ্বলে গেছে। তার বিদ্যুৎ সমস্যার কবে সমাধান হবে সে জানে না। 'ছবি' সমস্যার সমাধান হলে কী তার পাম্পটি সচল হবে? হবে না। কারণ পাম্পটি সচল হওয়ার জন্য ট্রান্সমিটারটি ঠিক করতে হবে। তমিজ মিয়ারা যাকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠিয়েছে, V-6 পাজেরোর মালিক বানিয়েছে– তিনি সংসদে এসে একবারও তমিজ মিয়াদের কথা মনে করেননি। সংসদে চিৎকার করে বলেননি বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা। তিনি সংসদ বয়কট করেছেন অথবা শুধুই ছবি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গণতন্ত্রের ধারক-বাহকরা তমিজউদ্দিন মন্ডলদের কৃষি উপাদানের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে ধান-পাট বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে তমিজ মিয়ারা। কে কিনেছে? যাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল সেই রাজনীতিবিদরা, তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। প্রতিদিন দেশে আট জন করে মানুষ খুন হচ্ছে অথচ এটা নিয়ে সংসদে আলোচনা হয় না। বাচাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নথি দেখে বাণী শোনান, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।' ওই নথি তৈরি করে দিয়েছে পুলিশ। যারা মূলত সন্ত্রাসীদের প্রধান সহায়ক।

তাহলে এ কোন গণতন্ত্রের যুগে বাস করছি আমরা? গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় তো তমিজ মিয়াদের মতামত প্রতিফলিত হওয়ার কথা। আসলে তমিজউদ্দিন মিয়ারা যাদের নিজেদের লোক মনে করে, সেই রাজনীতিবিদরা কখনো কারো হয় না। তাদের জীবনটা শুধুই নিজেদের জন্য। ধনী ও অভিজাতদের নিরঙ্কুশ স্বার্থরক্ষার তত্ত্বের নামই এখন গণতন্ত্র। বৈদিক আর্য শাসনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই ছিল শাসকগোষ্ঠী। এদের সংখ্যা ৬/৭ শতাংশের বেশি ছিল না। বাকি সবাই শ্রমজীবী শুদ্র ও অচ্ছুৎ। এরা কৃষিজীবী, মৎসজীবী, কামার-কুমার। এরাই তমিজ মন্ডল। গ্রিক সভ্যতার যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল। ইতিহাসে আছে এই ক্ষুদ রাষ্ট্রের নাগরিকদের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো রাষ্ট্র। কিন্তু ইতিহাসের সত্যটা হলো এই– নাগরিক

বলতে বোঝানো হতো শুধু 'দাস' মালিকদের। যারা ছিলো মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ। জনসংখ্যার বাকি ৯৪ শতাংশ পরিচিত ছিল 'ক্রীতদাস' হিসেবে। নাগরিক হিসেবে তাদের গণ্য করা হতো না। ক্রীতদাসদের নাগরিক অধিকার তো দূরের কথা, ন্যূনতম মানবিক অধিকারটুকুও ছিল না। বলা হয়, তমিজ মন্ডলরা এখন ক্রীতদাস নয়। তাদের নাগরিক অধিকার দেয়া হয়েছে। ভোট দিতে পারেন তারা। কিন্তু এর সঙ্গে দেশ পরিচালনায় তার মতামত প্রতিফলিত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রিক গণতন্ত্র ছিল ৬% মানুষের গণতন্ত্র। কয়েক হাজার বছর পরের বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অবস্থাও এর চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয়। ৬% মানুষের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো গ্রিক নগর রাষ্ট্র। আর বাংলাদেশ পরিচালিত হয় দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। সমগ্র বাংলাদেশ যেন দুই পরিবারের সম্পত্তি। দুই পরিবারের সদস্য এবং ১% বা ২% নাগরিক (যারা পরিচিত রাজনীতিবিদ নামে) ছাড়া সব নাগরিকই যেন সেই গ্রিক রাষ্ট্রের ক্রীতদাস।

কারো ছবি বা স্বাধীনতার ঘোষণা বিতর্ক তাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলে না। কারণ বিতর্কে তাদের সবুজ শস্য ফলে না। বর্ষার বৃষ্টি নামে না। তবে পূর্ণিমার ধর্ষণের ঘটনা তাদের জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। ধর্ষণের পর মহিমার আত্মহত্যাটাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না তমিজ মন্ডলরা। ধর্মের নামে ভবানী রায়ের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়াটাকে মানতে পারে না। মানতে পারে না শুধু দরিদ্র হওয়ার কারণে আক্কাস আলীর ভিটেবাড়ি দখল হয়ে যাওয়া। তমিজরা মনে মনে দরিদ্রের ওপর সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। তমিজরা ধর্ম বলতে শুধু মানুষকেই বোঝে। অর্চনা আর সালমার মধ্যে তাদের কাছে কোনো পার্থক্য নেই। যুগযুগ ধরে তারা এভাবেই বাস করে এসেছে পাশাপাশি। মানুষ নামক রাজনীতিবিদরা তাদের এই বন্ধন ভেঙে দিতে চায়। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা আক্রমণ করে। প্রগতিশীলরা আক্রান্তের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। ভোলার ধর্ষিতার পাশে না দাঁড়িয়ে আর্ট পেপারে তার রঙিন ছবি ছাপে দলীয় পোস্টারে। বের করে পোস্টার, স্যুভেনির। উদ্দেশ্য একটাই, নিজেদের প্রচার। বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানো হলে সংসদ থেকে পদত্যাগের হুমকি দেয়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের কোনো কর্মসূচি থাকে না। তমিজ উদ্দিন মিয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল আর প্রগতিশীলদের আলাদা করতে পারে না। তারা একই চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখে শুধু। প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের আক্রমণ করে। আর তথাকথিত প্রগতিশীলরা তাদের ব্যবহার করে। আক্রমণ ঠেকায় না।

শহরে দলটি উঠেছিল একটি কোল্ড স্টোরেজের রেস্ট হাউজে। হাজার হাজার মণ আলুর পাহাড় দেখে অবাক হয় তারা। এগুলো ফলিয়েছে কৃষকরা। শ'য়ে শ'য়ে ভ্যান গাড়ি আসছে পাকা রাস্তা ধরে। তমিজ উদ্দিন মন্ডলরা সারারাত বসে থাকে তার বিশ মণ আলু ঠিক মতো স্টোরে রাখার জন্যে। শহরে ছেলে-মেয়েরা অবাক হয় তার নিজের উৎপাদনের ওপর মায়া থেকে। বিমূর্ত হয়ে যায় নাগরিক তরুণ-তরুণীদের কাছে সবকিছু। এ কী ভালোবাসা নিজের সৃষ্টির প্রতি!

তমিজরা ধর্ম বলতে শুধু মানুষকেই বোঝে। অর্চনা আর সালমার মধ্যে তাদের কাছে কোনো পার্থক্য নেই। যুগযুগ ধরে তারা এভাবেই বাস করে এসেছে পাশাপাশি। রাজনীতিবিদরা তাদের এই বন্ধন ভেঙে দিতে চায়। প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরা আক্রমণ করে। প্রগতিশীলরা আক্রান্তের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। ভোলার ধর্ষিতার পাশে না দাঁড়িয়ে আর্ট পেপারে তার রঙিন ছবি ছাপে দলীয় পোস্টারে

একদল তরুণ উদ্যোক্তাদের এই কোল্ড স্টোরেজে জমা পড়ে হাজার হাজার মণ আলু। আগস্টে গিয়ে বাজারের আলু শেষ হলে নগরবাসীর কাছে পৌঁছে যাবে এই আলু। নাগরিক তরুণ-তরুণীরা মেয়েদের স্কুল দেখে মুগ্ধ। কি সবুজ চেহারা কি সাবলীল! হঠাৎ দেখলো একটি পাজেরো জীপ দু'দুটি মোটর সাইকেল এলো স্টোরেজের অফিসে। জীপটি ঘন্টা খানেকের মধ্যে চলে গেলো। পরে জানা গেল স্থানীয় এম পি এসেছিলেন। তিনি তার চাঁদা নিয়ে গেলেন সঙ্গে মাস্তান নিয়ে। তমিজ মন্ডল তখনও বসে আছে লাইনে।

ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া শহুরে ছেলে-মেয়ের দলটা মুক্তিযোদ্ধা বাবার মুখে গল্প শুনেছে তমিজ উদ্দিন মন্ডলদের। সেই গল্প '৭১-এর গল্প। সেই গল্প বিজয় আর গৌরবগাথার গল্প। সেই গল্পের নায়ক একজন ওহাবের বীরত্ব কাহিনী ৩১ বছর বয়সী বাংলাদেশে আজ ম্লান হওয়ার পথে। বাবা এক সময় গল্প বলতো, আর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তো অশ্রু। এক সপ্তদর্শী ভাবে তার বাবা কি গোপনে কাঁদে তাদের স্বাধীনতা দেখে! না, এখন কান্না শুকিয়ে গেছে!

পিয় স্বদেশকে ভালোবেসে যারা কাস্তে হাতে যুদ্ধে গিয়েছিল, শহর থেকে পালিয়ে যাওয়া পরিবারগুলোকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল, নিজে না খেয়ে খাইয়েছিল অতিথিদের। নিজে সারারাত বারান্দায় বসে থেকে অতিথিদের ঘুমাতে দিয়েছিল ছোট্ট ঘরে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। শহরের মানুষ আবার শহরে ফিরে এসেছে। কেউ মনে রাখেনি ওহাবের বীরত্ব কাহিনী। '৭১-এর ভয়ঙ্কর গেরিলা নজু ভাইদের কেউ মনে রাখার প্রয়োজন করেনি। নজু ভাইরা নিজেরাও হারিয়ে গেছেন নিজের কাছে। খুলনার গল্লামারী স্মৃতিসৌধের ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার আজও পতাকা ওঠায়, পতাকা নামায়। তার কথাও কেউ মনে রাখেনি। গুরুদাসী এখনো তার ধর্ষণকারীদের বিচার চাইতে চাইতে জ্ঞান হারায়। খুলনার মানুষ তাকে জানে 'পাগলী গুরুদাসী' হিসেবে।

আমরা অনেক দিন পরপর গ্রামে যাই। কেউ বিস্মিত আর কেউ অভিভূত হয়ে ফিরে আসি। তারপর মিশে যাই স্বাভাবিক স্রোতে, আপন গতিধারায়। যেখানে তজিম উদ্দিন মন্ডলরা আমাদের কেউ নয়। তারা উৎপাদন করবে আর আমরা রাজনীতি নিয়ে রাজপথ উত্তপ্ত করব। হরতাল-ধর্মঘটে অচল করে দেব দেশ। আমাদের সমস্যা কী?

দেশ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে ২৪ ঘন্টা উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য তমিজউদ্দিন মন্ডলরা তো আছেনই!

আমাদের রাজনীতিবিদরা এখন বেঁচে আছে শুধু নতুন নতুন তত্ত্ব, বিতর্ক আবিষ্কারের জন্য। আমাদের তমিজ মিয়াদের তারা সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে চায় না। স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পরও তারা চায় শুধু তাদের আখের গোছাতে। এই কী আমাদের ভাগ্যে ছিল? এই কী ছিল নিয়তী? এটাই কি দেখতে চেয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা?

হায় '৭১! হায় গণতন্ত্র!! হায় স্বদেশ!!!